দৈনিক ইত্তেফাক

APR. 04 2002

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ফার ইষ্টার্ন ইকনমিক রিভিউর দৃষ্টিতে

বাংলাদেশে মৌলবাদের উত্থান ও ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা বিস্তার লাভ করছে

[বাংলাদেশ প্রসঙ্গে 'ফার ইষ্টার্ন ইকনমিক রিভিউ-এ সম্প্রতি প্রকাশিত বিতর্কিত প্রতিবেদনটি এখানে পত্রস্থ হোল]

বাংলাদেশে একটি বিপ্লব ঘটানোর আয়োজন চলছে। এই মুহূর্তে তা ঠেকানো না গেলে কেবল বাংলাদেশই নয় বরং এর সীমানা পেরিয়ে অন্যত্রও গোলোযোগের ঢেউ আছড়িয়ে পড়বে। ইসলামী মৌলবাদ, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, উগ্রবাদী মুসলিম সংগঠনসমূহ, ভুঁইফোড়ের মতো গজিয়ে ওঠা মাদ্রাসা, মধ্যবিত্তের হতাশা ও ক্ষোভ, দারিদ্র্য এবং অরাজকতা গোটা দেশটিকে লন্ড-ভন্ড করে দিয়ে এর রূপান্তর ঘটিয়ে দিচ্ছে। উপরের কথাগুলো বেশ পরিচিত মনে হয় তাই না? হ্যাঁ পাকিস্তানের সঙ্গে এর মিল পাওয়া যায়। আর এককালে এই দেশ পাকিস্তানেরই অংশ ছিল। এখন বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম এই মুসলিম দেশটি ধীরে ধীরে তার মধ্যপন্থী ইসলামী ভাবধারা থেকে ক্রমান্বয়ে দূরে সরে যাচ্ছে। সরকার এই পরিবর্তনের মুখে বলতে গেলে একেবারেই অসহায়। মনে হয় এই ঢেউ প্রতিহত করার ক্ষমতা যেমন তার নেই তেমনি নেই কোন আগ্রহ। উদারপন্থী মুসলমান আর সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠী আজ সেখানে উগ্রবাদীদের রোষাণলের শিকার।

বাংলাদেশের এই অস্থিতিশীলতা দাতাদেশগুলোকেও দারুণ শংকিত করে তুলেছে। গত মাসে প্যারিসে অনুষ্ঠিত তাদের বার্ষিক বৈঠকে ভবিষ্যত উন্নয়ন সাহায্য পেতে হলে আইন-শৃংখলার উন্নতি সাধনের বিষয়টিকে এর সঙ্গে যুক্ত করতে বলা হয়েছে বাংলাদেশী কর্তৃপক্ষকে। যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রবর্গ মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত তাদের সন্ত্রাসবাদ বিরোধী যুদ্ধের সম্প্রসারণ ঘটালেও বাংলাদেশে বেড়ে ওঠা গভীর ও সুদূরপ্রসারী বিপজ্জনক পরিস্থিতিকে যেন একেবারেই আমল দিচ্ছে না। ঢাকায় নিযুক্ত একজন ঊর্ধ্বতন পশ্চিমা দূত বলেছেন যে, বাংলাদেশে উগ্র-মৌলবাদীদের অস্তিত্ব থাকলেও তারা দলে তেমন ভারী নয়। দেশের মূল স্রোতধারায় তাদের কোন ভূমিকা নেই। এ থেকে বোঝা যায় যে, ঐ কূটনীতিক এই আসন্ন হুমকির বিষয়টিকে খাটো করে দেখছেন।

দেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দল যথা ধর্মনিরপেক্ষ ও বাম ঘেঁষা আওয়ামী লীগ এবং রক্ষণশীল বিএনপি ১১ই সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে সংঘটিত সন্ত্রাসী হামলার ব্যাপারে তাৎক্ষণিকভাবেই নিন্দা জ্ঞাপন করেছিল। গত অক্টোবরের সাধারণ নির্বাচনের আগে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার যখন দেশ পরিচালনা করছিল তখন উভয় দলই মৌলবাদ দমনে যুক্তরাষ্ট্রকে সহযোগিতা করার এমনকি মার্কিন জঙ্গী বিমানকে বাংলাদেশের আকাশসীমা ব্যবহার করতে দেয়ার ব্যাপারেও আগ্রহ দেখিয়েছিল।

কিন্তু বাংলাদেশে কি ধরনের পরিবর্তনের হাওয়া বইছে তা বোঝা যাবে বিএনপির সঙ্গে মৌলবাদী জামাত-এ-ইসলামীর গাঁট ছড়া দেখে। গত নির্বাচনে বিএনপি'র সঙ্গে জোট বদ্ধ হয়ে জামাত তিনশো আসনবিশিষ্ট জাতীয় সংসদের ১৭টি আসন লাভ করতে সক্ষম হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ঘোরতর বিরোধিতাকারী জামাত এই প্রথমবারের মত বাংলাদেশ সরকারের অংশীদার হতে পেরেছে। এর নেতা মতিউর রহমান নিজামীকে কৃষি মন্ত্রী করা হয়েছে আর সংসদ সদস্য আলী আহসান মোহাম্মদ সমাজকল্যাণ দফতরের দায়িত্ব পেয়েছেন এই মন্ত্রিসভায়। অপর একজন কূটনীতিক এ প্রসঙ্গে মন্তব্যকালে বলেছেন যে, উন্নয়নগামী বিশেষতঃ কৃষি ভিত্তিক এই বাংলাদেশের জন্য ঐ দু'টি পদই অত্যন্ত শক্তিশালী পদরূপে বিবেচিত হয়। জামাত অবশ্য আপাতত ইসলামী হুকুমাত কায়েম বিষয়ে খুব একটা বাড়াবাড়ি করছে না। দারিদ্র্য বিমোচনকে তাদের প্রধান লক্ষ্য বলে বর্তমানে প্রচার করছে। অবশ্য, যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসবাদ বিরোধী যুদ্ধের বিরুদ্ধেই এরা অবস্থান নিয়েছে। আমেরিকার আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য অক্টোবরে তারাও চাঁদা তুলেছিল। জামাত অত্যন্ত সন্তর্পণে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের লক্ষ্যে যখন এগিয়ে চলেছে তখন সরকারে এই দলের অংশীদারীত্বের কারণে দেশের অন্যান্য উগ্রপন্থী মৌলবাদী ব্যক্তি ও সংগঠন চাঙ্গা হবার প্রেরণা পাচ্ছে। এদের মধ্যে খতিব মওলানা উবায়দুল হক থেকে শুরু করে প্রায় এক ডজন চরমপন্থী গ্রুপ রয়েছে যারা বাংলাদেশী তালেবান নামে পরিচিত। হরকাতুল জেহাদ আল ইসলামী নামক একটি ছায়া সংগঠন আছে যেটি ১৯৯২ সালে পাকিস্তানের এক মৌলবাদী সংগঠনের শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী নেতা ওসামা বিন লাদেনের সমর্থন ও অর্থানুকূল্যে এই সংগঠনটি চলে বলে জানা যায়।

পশ্চিমা গোয়েন্দারা মনে করেন ১৯৯৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লাদেনের জেহাদ সংক্রান্ত ঘোষণা পত্রে বাংলাদেশের জেহাদ আন্দোলনের পক্ষ থেকে স্বাক্ষরদানকারী জনৈক ফজলুর রহমান বর্তমানের এই স্বতন্ত্র গ্রুপের একজন নেতা। উপরন্তু গত এক দশকে দেশের সর্বত্রই ভুঁইফোড়ের মত মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে। এ ধরনের ৬৪ হাজার মাদ্রাসা থেকে প্রতি বছরই হাজার হাজার মৌলবাদী সৃষ্টি হচ্ছে। একজন ঊর্ধ্বতন অবসরপ্রাপ্ত সরকারী আমলা এদেরকে সম্ভাব্য রাজনৈতিক মেয়াদী বোমা হিসেবে অভিহিত করেছেন। পাকিস্তানের মতই বাংলাদেশে মৌলিক শিক্ষা দেশের অধিকাংশ মানুষেরই ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকায় এই মাদ্রাসা শিক্ষার এত ব্যাপক প্রসার লাভ ঘটছে। সরকারের আদৌ কোন নিয়ন্ত্রণ নেই এই মাদ্রাসা শিক্ষার উপর। একজন সাংবাদিক এই শিক্ষা প্রসঙ্গে সম্প্রতি যথার্থই বলেছেন যে, মাদ্রাসা থেকে পাস করার পর দেশের মূল স্রোতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার কোন উপকরণই এদের কাছে থাকে না। তখন স্বার্থান্বেষী কোন গোষ্ঠী বা মহল ইসলামের দোহাই পেড়ে এদের ভাবাবেগকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগায়। প্রলোভনের ফাঁদে পা দিয়ে এরা তখন সঙ্গত কারণেই এক একটা গোঁড়া ও ধর্মান্ধ জীবে পরিণত হয়। আধুনিক মুসলমান হওয়ার কোন পথ খোলা থাকে না এদের জন্য তখন। মাদ্রাসাগুলির মূল লক্ষ্য হচ্ছে, ধর্মীয় অনুশাসন এবং এর অনেকগুলি চলে আরব দেশগুলির অর্থ সাহায্যে। পাকিস্তানে যেমন এ জাতীয় অর্থানুকূল্যে পরিচালিত মাদ্রাসাগুলি তালেবান নেতাদের প্রাথমিক শিশু শিক্ষালয় ছিল ঠিক তদ্রুপই বাংলাদেশী মাদ্রাসাগুলিরও কালক্রমে ইসলামী বিপ্লব রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ার আশংকা রয়েছে। বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ ঐতিহ্য মৌলবাদের এই উত্থানজনিত কারণে অচিরেই মারাত্মক ঝুঁকির মুখে পড়ে যেতে পারে। হিন্দুদের ওপর আক্রমণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। হিন্দুদের অধিকাংশই ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগের সমর্থক।

নির্বাচনের আগে থেকেই সংখ্যালঘুদের ভয়-ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছিল কিন্তু নির্বাচনের পর পরই তা মারাত্মকভাবে বেড়ে যায়। একটি স্থানীয় এনজিওর প্রতিবেদনে এই বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। অন্যদিকে এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনালের প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, প্রধানতঃ বিএনপির নেতৃত্বাধীন ঐক্যজোটই এইসব ভয়-ভীতি প্রদর্শনের জন্য দায়ী। বিশ্লেষকদের মতে, এসব কারণে প্রতিবেশী বার্মা ও ভারতে মুসলমানরা সংখ্যালঘু হলেও ঐ দেশ দু'টিও ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এ পরিস্থিতিতে বিষয়টিকে হালকাভাবে নেয়ার বা দেখার কোন অবকাশই পাশ্চাত্য বিশ্বের জন্য থাকতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মওলানা উবায়দুল হক ঢাকায় জাতীয় মসজিদে আয়োজিত লাখো মুসলমানের এক ধর্মীয় সমাবেশে বক্তৃতাকালে যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের কঠোর নিন্দা করে আমেরিকার বিরুদ্ধে জেহাদের ডাক দেন। ঈদের জামাতে মন্ত্রী পরিষদের সদস্যদের উপস্থিতিতেই তিনি বলেন, 'প্রেসিডেন্ট বুশ ও যুক্তরাষ্ট্রই হচ্ছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ সন্ত্রাসী। বুশ ও যুক্তরাষ্ট্র উভয়কেই তাই ধ্বংস করতে হবে। বাংলাদেশের ১২ কোটি মানুষ থুথু ছিটালেই আমেরিকা ভেসে যাবে।'

আফগানিস্তানে যুদ্ধ চলাকালে ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় মার্কিন বিরোধী মৌলবাদী বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে লাদেনের ছবিও শোভা পেতে দেখা যায়। এদিকে, ভারতের ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তারা রিভিউকে জানিয়েছে যে, গত ২২শে জানুয়ারী কলকাতার আমেরিকান কালচারাল সেন্টারে যে সন্ত্রাসী হামলা চলে তা ছিল পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থার সমর্থনপুষ্ট হরকাতের বন্দুকধারীদের কাজ। ঐ ঘটনায় ৪ জন পুলিশ মারা যায়। ভারতীয় পুলিশ কর্মকর্তারা আরও অভিযোগ করেন যে, ঐ পাকিস্তানী সংস্থাটি আফগানিস্তানের তালেবানকে মদদতো দিচ্ছিলই উপরন্তু বাংলাদেশের সীমান্ত পথে সন্ত্রাসীদের। পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ ঘটানোর ব্যবস্থা করে। অবশ্য বাংলাদেশ অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। ভারতীয় পুলিশ ও বিশ্লেষকরা আরও মনে করেন যে, এ হরকত গ্রুপের সঙ্গে পাকিস্তানের নিষিদ্ধঘোষিত মৌলবাদী সংগঠন, যেমন জইশ-এ-মোহাম্মদ ও লস্করে তৈয়বার এবং মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে যোগসূত্র আছে।

প্রমাণ আছে যে, হরকত সদস্যরা এবং বার্মার মুসলিম শরণার্থী বা রোহিঙ্গারা কাশ্মীর আফগানিস্তান ও রাশিয়ার চেচনিয়ায় উগ্রবাদী মুসলমানদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করতে গিয়েছিল। এদিকে, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে রিভিউর প্রতিনিধি মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া থেকে সেখানে আগত মুসলিম চরমপন্থীদের সাক্ষাৎ পান। এদেরকে স্থানীয় মুসলিম গ্রুপগুলির সঙ্গে বৈঠক করতে দেখা যায়। ঐসব এলাকায় তাদের উপস্থিতি এই আশংকারই জন্ম দেয় যে, বাংলাদেশ অচিরেই বিভিন্ন দেশের উগ্রবাদীদের বিচরণের স্বর্গ হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু বর্তমানে এসব মৌলবাদী হুমকি বৃদ্ধি পেলেও বলতেই হবে যে, মৌলবাদের প্রভাব বাংলাদেশের জন্য কোন নতুন ঘটনা নয়। এদের জন্য পথ আসলে সামরিক বাহিনীই উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। ক্ষমতায় থাকার জন্য সামরিক বাহিনীকে ধর্মনিরপেক্ষ ও বামপন্থী নীতি আদর্শ ঘেঁষা আওয়ামী লীগের বিপরীত ধর্মী একটি শিবিরের সমর্থনের প্রয়োজন ছিল। উল্লেখ্য, স্বাধীনতার পর থেকেই স্বাধীনতার পক্ষ বিপক্ষ দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে এই দেশ। যাহোক, এরপর হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ ক্ষমতায় আসার পর এক্ষেত্রে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে। ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করেন তিনি। এছাড়া ধর্মনিরপেক্ষ শিবিরকে ঘায়েলের জন্য তিনিই আবার জামাতকে চাঙ্গা করে তোলেন। সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে মৌলবাদীদের গভীর সংশ্রব আছে বলে জানা যায়।

১৯৯৩ সালে ইসলামের কিছু কিছু বিষয়ের সমালোচনা করায় লেখিকা তাসলিমা নাসরিন যখন মৌলবাদীদের হত্যার হুমকির শিকার হন তখনই কেবল বহির্বিশ্ব বাংলাদেশে মৌলবাদের এই উত্থান বিষয়ে জানতে পারে। মৌলবাদীদের ঘোষিত মৃত্যু পরোয়ানা মাথায় নিয়ে তাসলিমা দেশত্যাগ করেন এবং ১৯৯৮ সালে অসুস্থ মাকে দেখতে দেশে এলেও তিনি মৌলবাদী চাপের মুখে পুনরায় দেশত্যাগে বাধ্য হন। বাংলাদেশের মানবাধিকার গ্রুপগুলির মতে তাসলিমার তো বটেই এমনকি ১৯৯৯ সালে দেশে ধর্ম নিরপেক্ষ আদর্শের প্রতীক রূপে বিবেচিত কবি শামসুর রাহমানের প্রাণনাশের প্রয়াসের পিছনে হরকাতুল জেহাদেরই হাত ছিল। সত্তর বছর বয়স্ক এই কবি গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বিরোধী অপশক্তি তথা মৌলবাদকে প্রতিহত করার সংগ্রামে নিয়োজিত একটি সংগঠনের প্রধানরূপে আসীন ছিলেন। গত এক দশকে মৌলবাদ হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগুলেও বর্তমান সরকারসহ পূর্ববর্তী সব সরকারই এ সমস্যাটির ব্যাপারে ঔদাসিন্যই দেখিয়েছে। হয়তো সমস্যাটি সমাধানের মত যোগ্যতাও তাদের নেই। বিরোধীদলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা গত মার্চে সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সারাদেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। পক্ষান্তরে প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি প্রধান খালেদা জিয়া আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে দেশে অরাজকতা সৃষ্টির পাল্টা অভিযোগ করেছেন। তবে তিনি শক্ত হাতে সন্ত্রাসদমনে অঙ্গীকারাবদ্ধ বলে জানিয়েছেন। বিদেশী সাহায্যের উপরই নির্ভরশীল এই দেশ আর সেই সাহায্য অব্যাহতভাবে পেতে হলে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির দিকে অবশ্যই সরকারকে বিশেষ নজর দিতে হবে। কিন্তু বিএনপি বা আওয়ামী লীগ দেশে সহিংস পরিস্থিতির জন্য পরস্পরকে দায়ী করেই চলেছে। কেউই এর আসল কারণ যে মৌলবাদের উত্থান এ সত্যটিকে যেন সনাক্তই করতে পারছে না। জোট সরকারের কর্মকর্তারা মৌলবাদকেন্দ্রীক কোন সমস্যা দেশে আছে বলে মানেন না। আবার মধ্যবিত্ত শ্রেণী মৌলবাদীদের বিষয়টিকে অপ্রাসঙ্গিক বলে জ্ঞান করছে। বেগম জিয়া গত জানুয়ারীতে তার মন্ত্রীসভায় জামাতীদের অন্তর্ভুক্তির পক্ষে সাফাই গাইতে গিয়ে বলেছেন যে, মন্ত্রীসভায় কোন তালেবান নেই। বিরোধী দলগুলি তখন জামাতী মন্ত্রীদেরকে তালেবান হিসেবে চিহ্নিত করে এই অভিযোগ উত্থাপন করেছিল। বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান সহিংসতার ঘটনায় সেখানে বসবাসরত বিদেশীরা উদ্বেগ প্রকাশ করলেও মৌলবাদী হুমকির বিষয়টিকে বেশ খাটো করেই দেখছেন তারা। কোন কোন পর্যবেক্ষকের মতে বাংলাদেশের সঙ্গে পাশ্চাত্যের অধিকাংশ দেশের সম্পর্কটা প্রধানতঃ দাতা-গ্রহীতার। সাহায্যের বিষয়টিই ঐসব দেশের কাছে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব পায়; ফলে এখানে কি যে স্রোত বইছে সেদিকে খুব একটা নজর দেয়া প্রয়োজন হয়তো ঐসব দেশের কূটনীতিকরা বোধ করেন না। তাই হয়তো মৌলবাদী তৎপরতাকে তারা খুব আমল দিচ্ছেন না। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার যখন বাংলাদেশ সফর করেন তখন আফগানিস্তানে যুদ্ধ চলছিল এবং বাংলাদেশেও ইঙ্গ-মার্কিন বিরোধী বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। তখন এদেশে মৌলবাদের এই উত্থান বিষয় ব্লেয়ারের সঙ্গে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের বৈঠকে তেমন গুরুত্ব পায়নি; সন্ত্রাসবাদ বিরোধী যুদ্ধই ছিল তখন আলোচ্যসূচীর মুখ্য বিষয়। বাংলাদেশ ঐ আলোচনাকালে আফগানিস্তানের জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বাহিনীতে যোগ দেয়ার বিষয় নিয়েই তখন বেশী উদগ্রীব ছিল। এখনও বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ ঐতিহ্যের শিকড় মজবুতই আছে। কিন্তু মৌলবাদ ক্রমান্বয়ে এখানে ভিত গাড়ছে। ইন্দোনেশিয়ায় যেমনটা দেখা গেছে অর্থাৎ অর্থনৈতিক ধস ও রাজনৈতিক সংকট সেখানে যেমন মৌলবাদী মুসলিম গ্রুপগুলোর উত্থান ঘটিয়েছে বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও দ্রুত তা ঘটা অসম্ভব নয়। অবশ্য এই প্রক্রিয়াকে বন্ধ করা যাবে না তা নয়। তবে দীর্ঘসময় ধরে এই প্রক্রিয়াকে চলতে দিলে বাংলাদেশের পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে পারে এবং দেশটি সন্ত্রাসীদের জন্য নতুন আশ্রয়স্থল রূপে প্রতিপন্ন হতে পারে। সুতরাং এখনও একে ঠেকানোর সময় হাতছাড়া হয়ে যায়নি। **ভাষান্তর : শাহীন রেজা নূর**